একুশ শতক শারদ সংখ্যা ২০১৭ র জন্য গল্প

শশাঙ্কশেখরের কথা

আশিস গিরি

রাস্তায় উঁচু উঁচু ল্যাম্পপোস্টে হ্যালোজেনের বদলে এখন ত্রিফলার আলো জ্বলছে।দোতালাতার ঝুলবারান্দায় বসে আলো-আঁধারি রাস্তা দেখছেন শশাঙ্কশেখর। অনেকদিন ধরেই কেমন একটা প্রত্যাশার জাল নিজের মনের মধ্যে বুনে আসছেন তিনি। তাঁর এই চার কাঠা জায়গার উপর একতলা দোতলা মিলিয়ে তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের বাড়িতে উপর নীচে ছ'খানা ঘর, সঙ্গে বাথরুম, কিচেন, ডাইনিং, ড্রইংরুম। বাড়ির সামনে একফালি ফাঁকা জয়গা।গাছ ভালোবাসেন তাই পরমব্রতা নিজের হাতে লাগিয়ে ছিলেন কয়েকটা ফল-ফুলের গাছ। পরিচর্যার অভাবে সেগুলো এখন ঝোপঝাড়ে পরিনত হয়েছে।সামনে পাঁচিল দেওয়া গেট, সারাক্ষণই প্রায় বন্ধ থাকে। পাঁচিলের গায়ে লেটার বক্স, তাতে বড় বড় করে লেখা 'এস এস গাঙ্গুলি, এ কে ৪৭৩। তার পাশেই কলিং বেলের স্যুইচ। শশাঙ্কশেখর শুধু ভেবেই আসছেন কেউ বোধহয় এসে কলিং বেল বাজাবে। এ কে ব্লকের এদিকটায় বড় শুনশান। আগেতো সন্ধে নামলেই বাড়িগুলোতে সেইযে দরজা বন্ধ হয়ে যেতো তেমন কোন দরকার ছাড়া পরদিন সকাল ছ'টার আগে খুলতোই না। এখন তাও রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কিছু গাড়িঘোড়া, লোকজন চলাচল করে সল্টলেকের এই দিকটায়। একেবারে প্রান্তবর্তী ব্লক। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কেষ্টপুর খাল, খাল নাকি কচুরিপানার নালা বোঝা কঠিন, শশাঙ্কশেখরের তখন চাকরির প্রায় শেষ কয়েক বছর। সিনিয়ার ডব্লিউ বি সি এস থেকে প্রমোটি আই এ এস। মাইনেটাও একটু বেড়েছে। এতোদিনতো একমাত্র ছেলে সৌখিনের উচ্চশিক্ষার জন্য যেভাবে খরচ করতে হয়েছে তাতে নিজের বাড়ি করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। স্ত্রী পরমব্রতা সংস্কৃততে অনার্স নিয়ে বি এ পাসের ডিগ্রি থাকলেও কোনদিন চাকরিবাকরির কথা ভাবেননি। শশাঙ্কশেখরের একার উপার্জনে দুটো সংসার টেনে, ছেলের পেছনে খরচ করে তাল রাখাটাই মুশকিল হয়ে পড়ত। হুগলির জয়রামবাটিতে তাঁর পৈতৃক বাড়ি। বাবা ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক। দুভাই এক বোনের মধ্যে শশাঙ্ক বড়। পৈত্রিক কিছু জমিজমা ছিল। বাবা চাকরিতে থাকতেই শশাঙ্ক ডব্লিউ বি সি এস পাস করে মেদিনীপুরের দাঁতনে বিডিওর চাকরিতে যোগ দিয়ে ছিলেন। কয়েকবছর বাদে ছোট ভাই মৃগাঙ্কও একটি হাইস্কুলে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিল। বাবা অবসর নেওয়ার ছ'মাসের মাথায় হঠাৎ করে মারা গেলেন। স্বাভাবিক ভাবেই সংসারের সমস্ত দায় এসে পড়ল তাঁর ঘাড়ে, এদিকে টেনিওর কমপ্লিট হতে নাহতেই বদলি তবু সবরকমের ঝক্কিঝামেলা সামলে শশাঙ্ক ভাইবোন দুটোর বিয়ে দেওয়ার পরে নিজে বিয়ে করে ছিলেন তাই সৌখিন তাঁর একটু বেশি বয়সের একমাত্র সন্তান। চাকরি সুত্রে বেশ ককয়েকটি জেলা ঘুরে যখন কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংএ ঢুকলেন সেই সময় ছোটভাই তার সংসার নিয়ে ওর স্কুলের কাছাকাছি একটা জায়গা কিনে বাড়ি করল। শশাঙ্ক সল্টলেকের শ্রাবণী আবাসনের সকারি কোয়ার্টারে। সমস্যা বাধল মাকে নিয়ে, মা না থাকলেন ছোট ভাইএর কাছে না এলেন সল্টলেকে। সেই চিরাচরিত সেন্টিমেন্ট, 'স্বামী-শশুরের ভিটে.......।' অগত্যা একজন কাজের লোক, একজন জমি জায়গা দেখার ঠিকে লোক দিয়ে মাকে রাখতে হল জয়রামবাটিতে আর বড় ছেলে স্বেচ্ছায় গ্রহন করে ছিলেন সমস্ত দায় দায়িত্ব। শশাঙ্ক মনেপ্রানে বিশ্বাসও করতেন এটা তাঁর কর্তব্য। শুধুকি তাই মা যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রতি মাসে দুবার নিয়ম করে মাকে দেখে আসতেন তিনি। পরমব্রতাও কোন দিন কোনকিছু বলেননি পারলে স্বামীকে সঙ্গ দিয়েছেন সমস্ত ক্ষেত্রে। এতসব সামলে কলকাতায় নিজের বাড়ি করার কথা তাই ভাবতেই পারননি কখনো। শেষমেশ জয়রামবাটির পাঠ চুকিয়ে মা যখন বিদায় নিলেন শশাঙ্কশেখরের চাকরিও তখন শেষ লগ্নে, ভাইবোনরা বসে পৈত্রিক জমিজমা বিক্রিপাটা করে কিছু নগদ টাকা পেলেন প্রত্যেকে, আর ঠিক তখনই সল্টলেকে শেষ পর্যায়ে জমি বিলির বিজ্ঞাপণ বেরোল কাগজে। কপাল ঠুকে আবেদন করলেন শশাঙ্ক আর বেধেও গেল এ কে ব্লকের এই চার কাঠা প্লট। চাকরি থেকে অবসরের পর বেশকিছু টাকা হাতে এল তা দিয়েই দোতালা এই বাড়ি। মা মারা যাওয়ার পরেও বেশকিছু দিন ছুটিছাটায় ছেলে-বউকে সঙ্গে করে জয়রামবাটির বাড়িতে যেতেন শশাঙ্ক। ভাইবোনদের ডেকে পাঠিয়ে একসঙ্গে দু-একদিন কাটাতেন। নিজস্ব বন্ধনের পরিসর খুঁজে পেতেন মনের আনন্দে। সে পাঠ চুকিয়ে যখন এই

সল্টলেকের বাড়িতে পাকাপাকি বসবাস শুরু করলেন তখন প্রায়দিন সকালে উঠেই তাঁর মন কেমন করত।নানান ভাবে স্মৃতি জুড়ে ঘুরে বেড়াত বাবা-মা-ভাই-বোন, তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবন। নাড়ি ছেঁড়ার যন্ত্রণা অনুভব করতেন সারা শরীর জুড়ে। পরমব্রতা কোন কথা বললে তার উত্তর দিতেন না। এক আকাশ নস্টালজিয়া ঢেকে রাখত চোখমুখ। ইজি চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে ভাবতেন মায়ের মুখ, তাঁর ছোটবেলার গ্রাম, বাবার সঙ্গে স্কুলে যাওয়া এমন সব নানা মুহূর্তের অতীত দৃশ্য। কখনো ভেতরে ভেতরে কান্না পেত, কখনোবা সুখ অনুভব করতেন নিজে নিজে। একবারতো এমন হয়েছিল সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে নীচের তলায় ড্রইং রুমে পাতা ইজি চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন এদিকে পরমব্রতা কখন যে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতেই পারেননি । কাচের টি টেবিলে খটাস করে চায়ের কাপ রাখার শব্দ পেয়ে শশাঙ্ক বিড়বিড় করে বলেই ফেললেন, ‘মা শরীরটা কেমন ভালো লাগছে না, আজ আর স্কুলে যাবো না।’ সেই নিয়ে বাড়িতে কী হুলুস্থুল কান্ড। পরমব্রতার চেঁচামেচিতে হুড়মুড়িয়ে ছেলে দৌড়ে নামল দোতলা থেকে। হকচকিয়ে সম্বিত ফিরে পেয়ে শশাঙ্ক যতোই বোঝানোর চেষ্টা করছেন তাঁর কিছুই হয়নি, কে শোনে কার কথা, মা-ছেলে মিলে ডাক্তারকে ফোন। পরে অবশ্য বিষয়টা নিয়ে মজাই করে ছিল সৌখিন। হাসতে হাসতে বলে ছিল, ‘বাবা জয়রামবাটির মানুষতো তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রভাব একটু বেশি। থেকে থেকে নাহোক সারা দিনে একবার ধ্যানমগ্ন হতেই হয়।’ ছেলের কথা শুনে রে রে করে উঠেছিলেন পরমব্রতা। কপালে দু’হাত ঠেকিয়ে বলে ছিলেন,‘ঠাকুরকে নিয়ে মজা করিসনে বাবা।’ বরাবরই মায়ের বাধ্য ছেলে সৌখিন জিভ কেটে নিজের কপালে হাত ঠুকে ছিল।

আজ বড় স্মৃতিকাতর হয়ে উঠছেন শশাঙ্কশেখর।এই আশি ছুঁইছুঁই বয়সে দুচোখে পাকা ছানি কাটানোর পরেও তেমন একটা স্পষ্ট দেখতে পান না। ডাক্তার রেটিনা থেরাপির নিদান দিয়েছে, তাতে খুব একটা আগ্রহ নেই তাঁর।এদিকে বছর দুয়েক আগে হার্টে বাইপাস সার্জারি হয়েছে তবু খুব একটা ভালো বোঝেন না, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। গতকাল অনেক্ষণ ধরে ডাঃ মিত্রর সঙ্গে কথা বলেছে সোমলতা। কিসব বলছিল, আবার সেই ই সি জি, চেষ্ট এক্সরে, লিপিড প্রোফাইল, ইউ এস জি নানান রকমের টেষ্টের কথা। রাতে বোধহয় টেলিফোনে সৌখিনের সঙ্গে কথাও বলেছে কিন্তু শশাঙ্কশেখর ঠিক করেই রেখেছেন, আর যেকদিন বাঁচেন এভাবেই কাটিয়ে দেবেন। এমনিতেতো সারাদিন শুধু ওষুধ আর ওষুধ তার উপর আবার এই ঝক্কি ঝামেলা! টাকাপয়সার দিক থেকে কোন অভাব নেই তাঁর, যা পেনশান পান তাতে সারা মাস খরচপাতি চালিয়েও বাড়তি কিছু থেকে যায় তার উপর ছেলেতো আছেই। অ্যাব্রডে এত বড় চাকরি। গতকালই ব্যাঙ্ক থেকে এসে সোমলতা আপটুডেট পাসবইটা দেখিয়ে বলছিল দশ লাখের উপর টাকা জমেছে ব্যাঙ্কে। শশাঙ্কশেখর কাল থেকেই ভাবছেন কিছু টাকা তিনি রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে দান করবেন। সারা জীবন সততার সঙ্গে চাকরি করা ছাড়া তেমন করেতো নিজের হাতে সমাজের জন্য কিছু করেননি তাই যারা করে তাদেরকে যদি একটু সাহায্য করা যায় ক্ষতি কী। সৌখিনকে বলেছেন কথাটা তার আপত্তি নেই।সোমলতা বলছিল সৌখিন নাকি তাকে বলেছে টাকা দেওয়ার আগে সবদিক ভালো করে দেখেশুনে তবে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সোমলতা লেখাপড়া জানা মেয়ে।তাই শশাঙ্কশেখর ও সৌখিন উভয়েরই যথেষ্ট বিশ্বাস এবং ভরসা আছে তার উপর। ভাগ্যিস এই শেষ বয়সে তার মতো একটা মেয়েকে অবলম্বন হিসেবে পেয়ে ছিলেন শশাঙ্কশেখর না হলে পরমব্রতা চলে যাওয়ার পর জীবনটাই তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে উঠছিল দিন দিন। বিপত্নিক হওয়া যে কতটা কষ্টের তা প্রতি মুহূর্তে হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছিলেন তিনি। ভেবে ছিলেন পরমব্রতার আগেই যাবেন তিনি কিন্তু কালের পরিহাস তাঁর থেকে প্রায় সাত-আট বছরের ছোট পরমব্রতা হটাৎ করেই একদিন ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! আজ খুব মনে পড়ছে পরমব্রতাকে, বছর তিনেক আগে ইউ এস এ থেকে সৌখিনের প্রমোশনের খবরটা পেয়ে কি আনন্দটাই না পেয়ে ছিল, পরের দিন সক্কালবেলাতেই তড়িঘড়ি স্নান সেরে শশাঙ্কশেখরকে প্রায় টেনে নিয়ে গিয়ে ছিল দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে। ভাড়ার ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বারবার শুধু জিজ্ঞেস করছিল, ‘এবার কি ছেলেটা এদেশে ফিরে আসতে পারে না? ওদেরতো মাল্টি নেশেনাল কোম্পানি, শুনেছি কলকাতাতেও ওদের অফিস আছে, এবার নাহয় এখানে এসেই বস্ হত।’ সে দিন কোন উত্তর দিতে পারেননি শশাঙ্কশেখর।

আজকাল শশাঙ্কশেখরের কেবলি মনে হয় কী হবে এইসব টাকাপয়সা, ঘরবাড়ির? অসমর্থ শরীরে খুব একটা হাঁটা চলাও করতে পারেন না, তবু মাঝেমধ্যে ধীর পায়ে বারান্দা পেরিয়ে বাড়ির পিছন

দিকটায় যান। শিউলি ফুলের গাছটা বেশ বড় হয়ে উঠলেও তেমন করে যত্ন নেয় না ঠিকে মালি গৌতম। গত ক'দিন আগেই সে আবার জবাব দিয়ে গেছে মালির কাজ আর সে করতে পারবে না। খালপাড়ের ঝুপড়িতে থেকে আগে রিক্সা চালাত, সকালবেলায় এসে বাড়ির চারদিকটা সফসুতরো করে দিত তার জন্য মাস মাইনেও পেত। মাঝবয়সী গৌতম মিস্ত্রির বাড়ি পাথর প্রতিমার ওদিকে। যেদিন ভাড়াপত্তর তেমন হয় না সেদিন সন্ধেবেলায় এসে বাবুর সঙ্গে গল্পগুজব করত। এটাই বড় সাহচর্য শশাঙ্কশেখরের, বড় প্রয়োজন তাঁর জীবনে।পরমব্রতা চলে যাওয়ার পর একা বড় একা তিনি। সারা বাড়িতে নির্বাক একটা মানুষ শুধু সময় গোণে। গৌতমের স্ত্রী মালতি কাজ করে তাঁর বাড়িতে কিন্তু হলে কি হবে সে বেচারাও বোবা-কালা, ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝাতে হয় সবকিছু। একদিন কথা প্রসঙ্গে গৌতমই বলে ছিল,

-বাবু আজকাল এই টোটো বেরিয়ে যাওয়ার পর রিক্সায় তেমন একটা ভাড়া হচ্ছে না, যদি কিছু টাকা পয়সা পেতাম তাহলে রিক্সাতেই ব্যাটারি ইঞ্জিন লাগিয়ে, ফোনে কনটাক্ট ধরে আয় উপার্জন করতে পারতাম।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ছিলেন শশাঙ্কশেখর।জিজ্ঞেস করে ছিলেন,

- তা ওইসব করতে কত লাগে?

নড়েচড়ে বসে সঙ্গেসঙ্গে উত্তর দিয়েছিল গৌতম,

- পঁয়তিরিশ হাজার মতো লাগবে।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে ওদিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে আবার বলে ছিল,

- বাবু অনেকদিনতো আপনার সেবা করলাম, তা এই গরীবকে যদি টাকাটা ধার হিসেবে দেন তাহলে বেঁচেবর্তে থাকতে পারি।

- তা নাহয় পারি কিন্তু এতগুলো টাকা শোধ দেবে কি করে?

শশাঙ্কশেখরের এই কথায় যেন হাতের মুঠোয় চাঁদ পেল গৌতম, চোখ দুটো বড় করে বলেছিল,

- কেন, রোজ যা আয় করব তার অর্দ্ধেকটা দিয়ে যাবো আপনার কাছে আর মালীর কাজের জন্য মাসকাবারি যা দেন তার থেকেও মাসেমাসে কিছু কেটে নেবেন।

টাকাটা দিয়েছিলেন শশাঙ্কশেখর। গৌতম ব্যাটারি রিক্সা কিনে প্রথম সওয়ারি হিসেবে শশাঙ্কশেখরকে সি কে মার্কেট থেকে ঘুরিয়েও নিয়ে এসে ছিল। মাস ছয়েক প্রত্যেক সন্ধেয় এসে অল্প-বিস্তর টাকাও দিচ্ছিল কিন্তু ভাটা পড়ছিল তার মালীর কাজে। প্রথমে সপ্তাহে দু'দিন, তারপরে একদিন। ছ'মাস বাদে প্রত্যেক সন্ধ্যায় এসে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটারও একই দশা হল। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন শশাঙ্কশেখর। কষ্টটা যে শুধু টাকার জন্য তা নয়, কষ্টটা একাকিত্বের।সারাদিনে রান্নার লোক, ঘর মোছা, কাপড় কাচার লোক, কাগজওয়ালা, দুধওয়ালা, এমন কি বাজারহাট, ওষুধপত্র এনে দেওয়ার ঠিকে লোক সবাই যে যার মতো আসে, যন্ত্রের মতো কাজ করে চলে যায়। থাকার মধ্যে গৌতমের বোবা-কালা বউ মালতি। নীরব থাকতে থাকতে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে তাঁর, জল থেকে সদ্য তোলা মাছের মতো তিনি ছটপট করতে থাকেন কারোর সঙ্গে কথা বলার জন্য, অপেক্ষা করতে থাকেন কখন বিদেশ থেকে ছেলে সৌখিনের ফোন আসবে! তিনি নিজে যে তাকে ফোন করবেন তার উপায় নেই। মাল্টিনেশেনাল কোম্পানির বস, জীবনটাই তার অফিস। অফিসে বাইরের ফোন সেন্সার করা হয়, ওয়ারকিং আওয়ার নষ্ট হবে, সময়টাযে দৌড়োচ্ছে। ছেলের সময় অনুযায়ি সে যখন ফোন করবে সেই সময়টার জন্য হাপিত্যেস করে থাকেন বৃদ্ধ। চাকরিতে থাকতে সারাদিনে এত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হত যে এক সময় কথা বলার এনার্জিটাই হারিয়ে ফেলতেন আর এখন ঠিক তার বিপরিত। আত্মিয়স্বজনরাও আজকাল খুব একটা কেউ আসা যাওয়া করে না, ফোনটোনও করে না। সবাই যে যার মতো ব্যাস্ত। সময়টাযে এত দ্রুত পাল্টে যাবে কল্পনাই করতে পারেননি শশাঙ্কশেখর। পরমব্রতা চলেগেছে, আত্মীয়স্বজনরা হারিয়ে যাচ্ছে, নাড়ী ছিঁড়ছে প্রতি মুহূর্তে, উহ্ কী বিষন্ন এই সম্পর্কহীনতা! খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। শেষমেশ সৌখিনের পরামর্শেই গৌতম একদিন খুঁজে আনল সোমলতাকে। ওদের ওদিকেই বাড়ি। ফুলবাগানে কোন এক দূরসম্পর্কের মামার কাছে থেকে গুরুদাস কলেজে পড়ত। পাস গ্র্যাজুয়েট, চাকরিবাকরির চেষ্টা করছে কিন্তু তেমন একটা কিছু জুটছে না। গৌতমের কথাতেই সে শশাঙ্কশেখরের 'গভরনর্স' র কাজ করতে রাজি হয়ে গেল। ভালো মাস মাইনে সেইসঙ্গে থাকা খাওয়া ফ্রি। কাজটার পোষাকি নাম 'গভরনর্স' হলেও আসল কাজটা হল শশাঙ্কশেখরকে সঙ্গ দেওয়া। ওঁর সঙ্গে গল্পগুজব করা, কথা বলা। সৌখিন ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছে, ওদেশে নাকি নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে

কথা বলার জন্য ভাড়াটে লোক পাওয়া যায় আর সেটাই সোমলতার প্রধান কাজ। জীবনটা কী অদ্ভুত! এমন একটা সময় আসে যে কথা বলার সঙ্গী পাওয়া যায় না অথচ সবাক জীবনে কথা বলাটাও যে খাদ্য, পানিয়'র মতো জরুরী। যাইহোক সমস্ত নিয়ম মাফিক লোকাল থানায় সোমলতার সমস্ত ঠিকুজি-কুস্টি দিয়ে শশাঙ্কশেখরের বাড়িতে কাজে বহাল করা হল। কয়েকমাস মাত্র কাজে ঢুকেছে মেয়েটি। স্বভাব চরিত্র ভালো তবে তেমন করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। পড়াশুনোয়ও যে তেমন উজ্জ্বল তাও না তাই জগৎ-সংসারে হাজারো কথা থাকলেও ও সিনেমা সিরিয়ালের গল্প ছাড়া ও অন্য কিছুর ধার ঘেঁসে না। বড়জোর ওদের দেশের বাড়ির গল্প। টিভি দেখতে ভালো লাগে না শশাঙ্কবাবুর। মান্ধাতা আমলের একটি রেডিও সেটাই ওঁর সঙ্গী। কলকাতা 'ক' এর অনুষ্ঠান শোনেন। তবু রেডিও কিছু দেয়। কিন্তু আজকাল রেডিও সিগনাল এতোই খারাপ যে মিডিয়াম ওয়েভের অনুষ্ঠান প্রায় শোনাই যায় না। আর এফ এম ? সেতো শুধুই চর্বিত চর্বন, একই গান সারাদিনে দশ বার করে বাজায়, আর কী ভষায় কথা বলে ওরা! কি সব নাম অনুষ্ঠানগুলোর !'গানের গুঁতো,'' বিন্দাস কাকার মতো,' ' গ্ল্যাড টু প্যাঁক ইউ।'মনেমনে ভাবেন তাঁর হয়তো জেনারেশান গ্যাপ।

কলকাতয় কয়েকবছর থাকার ফলে সোমলতা চলায়ফেরায় এমনিতে স্মার্ট। কাজের আছিলায় আখচার বেরিয়েও পড়ে আর সব সময় কানে মোবাইল ফোন। কার সঙ্গে যে এত কথা বলে কে জানে। তাই শশাঙ্কশেখরের ক্রাইসিসটা যে খুব একটা মিটেছে তা নয়। এই আজ যেমন বেলা বারোটা নাগাদ বেরিয়েছে, রাত আটটা বাজল এখনও ফেরেনি। তবে মেয়েটার প্রতি কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে তাঁর। কিছু বলতে পারেন না। হয়তোবা ডুবন্ত মানুষের খড়কুটোর মতো ভেবে। একবার মুর্শিদাবাদের ওদিক থেকে তাঁর বাড়িতে মেরামতির কাজের জন্য কিছু রাজমিস্ত্রি এসে ছিল, তাদের মুখ থেকে শুনে ছিলেন ওখানকার কাহানীওয়ালাদের কথা। শশাঙ্কশেখর ভাবেন এখানেও যদি তেমন কাহানীওয়ালা থাকতো, ছোটবেলায় দেখেছেন তাঁদের গ্রামের বাড়িতে কালো আলখাল্লা পরা, মাথায় কালো কাপড় ঢাকা, গলায় হরেকরকমের পুঁতির মালা পরা, এক হাতে চিমটা আর এক হাতে চামর নিয়ে ফকিররা আসত, মানিক পীরের কাহিনী বর্ণনা করত গানের সুরে, এক অলীক জগতে নিয়ে চলে যেত।সেসব এখন গুপ্ত যুগের ইতিহাস বলে মনে হয়। আজ বিকেলে নিজে নিজে শিউলি গাছটার কাছে গিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন, সস্নেহে হাত বুলিয়েছেন ওর ডালপালায়। বর্ষায় ডাগরটি হয়ে শরতে ফুল ফোটানোর জন্য মুখিয়ে আছে। যে বছর সৌখিন ইউ এস এ তে গেল সে বছরই পরমব্রতা করুণাময়ীর রথের মেলা থেকে এনে চারাটিকে লাগিয়ে ছিলেন। বলে ছিলেন তাঁর ছেলের স্মৃতি। শিউলি ফুল খুব ভালোবাসত সৌখিন। এখন পরমব্রতা নেই আর সৌখিন, সেতো দুরদেশের যন্ত্রগুহায়। বৃদ্ধ শশাঙ্কশেখর শিউলি গাছের ডালপালায় হাত বোলাতে গিয়ে রবি ঠাকুরের বলাইকে মনে করছিলেন। তার মতো শিউলি পাতায় মুখ ঠেকিয়ে তিনি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করছিলেন, ' রোদ্দুরে তোমার খুব কস্ট হয় তাইনা বন্ধু?' কী গভীর লগ্নতা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের।

এখন তিনি একতলার ঘরে ইজি চেয়ারে বসে আছেন। রান্নার লোক রান্না সেরে চলে গেছে। ঘরের মধ্যে পুরোন একটা দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ, বাইরে বাগানে ঝিঁঝিঁর ডাক আর নিস্প্রভ চোখে কথাহীন শশাঙ্কশেখর তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে। মস্ত বড় বাড়িটায় গুহাবন্দি কোন এক আদি মানবের মতো।

সোমলতা একবার বলে ছিল খিদিরপুরে ওর এক পরিচিত আয়ুর্বেদ পাশ করা ডাক্তার আছে। খুব নামডাক, অ্যাপোয়ন্টমেন্ট পেতেই নাকি দু'মাস লেগে যায়, রোগির এত চাপ। কেরালা থেকে পঞ্চকর্ম থেরাপি নিয়ে গবেষণা করে নাকি গোল্ড মেডেল পেয়েছে। এমনিতে কল দিলে কোথাও যায় না তবে সোমলতা বলেকয়ে রেখেছে সময় করে একদিন শশাঙ্কশেখরকে দেখাতে নিয়ে আসবে। এই নিয়ে সৌখিনের সঙ্গেও তার কথা হয়েছে। বোধহয় ওই ব্যাপারেই ডাক্তারের কাছে গেছে সোমলতা। শশাঙ্ক বেশ কয়েকবার সোমলতার মোবাইলে ফোন করেছেন কিন্তু প্রতিবারেই এনগেজড টোন। অল্প বয়স বোধহয় কারোর সঙ্গে প্রেমটেম করে মেয়েটা। জ্যাঠু বলে ডাকে তাঁকে তাই হয়তো লজ্জায় কিছু বলতে পারেনি। শশাঙ্কও মেয়েটাকে বড় ভালোবাসেন। মনেমনে ঠিক করে রেখেছেন ও যদি বিয়ে থা করতে চায় তাহলে নিজের মেয়ের মতোই তাকে বিয়ে দেবেন তিনি। গৌতমের বউ সেই সকাল থেকে আছে সোমলতা না আসা পর্যন্ত বেরোতে পারছে না। মাঝেমধ্যে শশাঙ্কবাবুর কাছে এসে ইশারায় কি সব বলে যাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছেন

না শশাঙ্ক। অনেকদিন বাদে আজ গৌতম এসে ছিল তার ব্যাটারি রিক্সা নিয়ে। কাঁদোকাঁদো ভাব করে শশাঙ্কর সামনে পাঁচশ’ টাকা রেখে বলল,

- অপরাধ মার্জনা করবেন বাবু, বাজারের অবস্থা খুব খারাপ, কাজকারবার একেবারে হচ্ছে না বললেই চলে তাই লজ্জায় আমি এত দিন আপনার কাছে আসতে পারিনি। এখন এই ক’টা টাকা রাখুন তবে কথা দিচ্ছি জীবন থাকতে আমি আপনার টাকা শোধ করে দেবোই। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওর বউ মালতি। কেমন একটা বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালো গৌতমের দিকে। বেশিক্ষণ থাকেনি গৌতম। যাবার সময় চেঁচিয়ে ওর বউকে বলে গেল,

- সোমলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত তুই বাবুকে ছেড়ে যাবি না।তেমন যদি মনে করিস রাতটা এখানে থেকে যাবি, বাড়িতে আমি ম্যানেজ করে নেব।

শশাঙ্কশেখরের বুকের ভেতর চাপা পাথরটার ভার বেড়ে উঠছে। টিভির স্যুইচ অন করে খবর দেখার চেষ্টা করলেন কিন্তু কী বিভৎস! আর সহ্য করতে পারছেন না তিনি। দু’দিন ধরেই সেই চূড়ান্ত অমানবিক খবরটা সবকটি চ্যানেলে। পুরুলিয়ার একটি তিন বছরের শিশু কন্যার সারা শরীরে সূচ! বিকৃতকাম এক প্রৌঢ়ের নারকীয় লালসার শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেল শিশুটি!বন্ধ করে দিলেন টিভি। চোখের জন্য খুব একটা পড়াশুনোও করতে পারেন না তবু তাক থেকে রামকৃষ্ণ কথামৃতটা পেড়ে ঘরের টিউব লাইট জ্বালিয়ে চোখ বোলাবার চেষ্টা করলেন। পড়তে পারছেন না। কোলের উপর বইটা রেখে আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে খানিকক্ষন চোখ বুজে থাকলেন।

আজ বারবার শুধু শিউলি গাছটাকেই মনে পড়ছে। পরমব্রতা বলতেন, ‘ আমি যখন থাকবো না তখন এই গাছে ফুল ফুটলে মনে করবে সেই ফুলের গন্ধের সঙ্গে আমি মিশে আছি।’ এদিকে বুকের ভেতরে চাপা কষ্ট তার উপর শরীরটাও আজ বেশ খারাপ লাগছে। নিয়ম করে ব্লাড প্রেসারের ওষুধ খেলেও প্রেসারটা কমছে না কিছুতেই। বিকেল থেকেই হাত পা কাঁপছে, মাথা ঘুরছে। জীবনটা বোধহয় তাঁর ফুরিয়ে আসছে। এইসব ভাবতে ভাবতে শশাঙ্কশেখর দেখলেন বাড়ির সামনে একটা ওলা ক্যাব এসে থামল। খানিক পরে কলিংবেলের আওয়াজ। পাশেই বসে ছিল মালতি। সোমলতা ফিরল বোধহয়। শশাঙ্ক ইশারায় সামনের দরজা খুলে দিতে বললেন মালতিকে। ঘরে ঢুকল সোমলতা সঙ্গে ব্রিফকেস হাতে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। শশাঙ্ক দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন রাত সোওয়া ন’টা। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সোমলতা,

- জ্যাঠু ইনিই সেই বিখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ও গবেষক ডাক্তার সুবিমল হালদার। তোমার শরীরটা কয়েকদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না দেখে আজকে জোর করেই ধরে নিয়ে এলাম।

শশাঙ্কশেখর ডাক্তারবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বসতে বললেন। প্রতি নমস্কার জানিয়ে ডাক্তার হালদার একটু মুচকি হেসে বললেন,

- আর বলবেন না, চেম্বারে পেশেন্টের এত চাপ তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। যাই হোক আপনার কিছু প্রাইমারি চেক-আপ করব,

বলেই ফটাফট ব্রিফকেস থেকে ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র, স্টেথোস্কোপ বার করে রোগি দেখতে শুরু করলেন ইতিমধ্যে সোমলতা শশাঙ্কশেখরের সমস্ত পুরোন প্রেসক্রিপশান, রিপোর্ট এনে ডাক্তারবাবুর সামনে রাখল। হাঁ করে তাকিয়ে আছে মালতি। সব দেখেশুনে ডাক্তার হালদার বললেন,

- হার্টের কন্ডিশান খুবই ক্রিটিক্যাল, স্পাইনাল কর্ডেরও একটা বড় প্রবলেম দেখা দিয়েছে যেটা সমস্ত নার্ভাস সিস্টেমকে ডেমেজ করে দিতে পারে। তাছাড়া আগের রিপোর্টগুলোতে যা দেখছি তাতে পেনক্রিয়াস এবং প্রোস্টেটেরও প্রবলেম আছে। যাইহোক আমি আরো কতগুলো টেস্ট লিখে দিয়ে যাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওগুলো করিয়ে নেবেন। স্পাইনাল কর্ডের সমস্যার জন্য আমি কয়েকটা হার্বাল মেডিসিন দিচ্ছি এগুলো আজ থেকেই শুরু করুন। দু-একটা ব্যায়ামের জন্যও লিখে দিচ্ছি। ফিজিওথেরাপিস্ট ডেকে করাবেন।

কথাগুলো শেষ করেই প্রেসক্রিপশান আর একটা ওষুধের বাক্স সোমলতার হাতে ধরিয়ে দিলেন ডাক্তার হালদার। শশাঙ্কশেখর সোমলতাকে ইশারা করে জানতে চাইলেন ফি আর ওষুধের দাম মিলিয়ে কত? বুঝতে পেরে ডাক্তার হালদার বললেন,

- সব মিলিয়ে আমাকে একুশ' পঞ্চাশ দেবেন। নিজের কাছে হ্যান্ডব্যাগে রাখা আলমারির চাবিটা সোমলতার দিকে এগিয়ে ধরলেন শশাঙ্কশেখর।

জীবনের প্রতি তেমন আর মায়া নেই শশাঙ্কশেখরের। ডাক্তার আজ যা বলে গেল তা নিয়ে ভ্রুক্ষেপ করেননি তিনি। যা হয় হবে। তবু সোমলতা রাত দশটার সময় খাবার আগে আয়ুর্বেদ ডাক্তারের দেওয়া একটি ক্যাপসুল খাইয়ে দিয়ে ছিল খাবার খাওয়ার আধঘন্টা বাদে আর একটা। খেতে ইচ্ছে ছিল না বলে তেমন একটা কিছু খাননি শশাঙ্ক। বেশি রাত হয়ে গেছে বলে মালতিও আজকে বাড়ি যায়নি। রাত এগারোটা নাগাদ বিছানায় শুতে গিয়ে তলপেটটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। নীচের তলায় ঘুমোন শশাঙ্ক, অ্যাটচড বাথরুম তবু কেমন ভয় কর ছিল একা একা যেতে। সোমলতা থাকে দোতলায়। শশাঙ্কর ঘরের সামনে ড্রয়িংরুমের মেঝেতে বিছানা পেতে শুতে যাচ্ছিল মালতি। তাকে ইশারায় ডেকে তাঁর ঘরের মেঝেতে শুতে বললেন। মালতি দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে, শশাঙ্কশেখর বাথরুমে গিয়ে কোমটে বসে থাকলেন অনেক্ষন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না,। একই ভাবে চিনচিন করে যাচ্ছে তলপেটটা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদে যদিওবা তলপেটের ব্যাথাটা কমল, বুকটা ভারি হয়ে উঠল। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তিনি। যদিও রোজকার মতো ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন তবু ঘুম আসছে না কিছুতেই। সারারাত এপাশ ওপাশ করেছেন, ভোরবেলায় বিপদ বাড়ল আরো, একসময় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ছিলেন, হঠাৎ কোন কিছুর শব্দে তাঁর সে ভাবটা কেটে গেল মনে হল কেউ যেন সামনের দরজা খুলল। পাশ ফিরে দেখলেন মালতি ঘুমোচ্ছে। শশাঙ্ক চিৎকার করে মালতিকে ডাকতে চাইলেন কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। একবার, দুবার, অনেকবার.......তিনি চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না কিছুতেই। হাত দুটো তুলে বিছানায় আঘাত করার চেষ্টা করলেন, তাও পারলেন না অবশ হয়ে গেছে দুটো হাতই। বুকের চাপ বাড়ছে, শশাঙ্কশেখর এবার পা দুটো নাড়াতে চেষ্টা করলেন, বাঁ পা টা প্রায় অসাড়, ডান পা টা মোটামুটি! জোরে জোরে তিনি ডান পা দিয়ে বিছানায় আঘাত করলেন কিন্তু কোথায়? না সোমলতা উপর থেকে নামছে না মালতি জেগে উঠছে। শশাঙ্কশেখর শরীরটাকে কোনরকমে নাড়িয়ে খাটের এক পাশে এসে ডান পা টা ঝুলিয়ে ধরে জোরে আঘাত করলেন নীচে শুয়ে থাকা মালতির গায়ে। হকচকিয়ে উঠে পড়ল মালতি। দুচোখ ডলে নিয়ে বাবুকে এই অবস্থায় দেখে আঁ.....আঁ.... করে গোঁগাতে লাগল সে। তবু সোমলতার কোন সাড়া নেই।কোন রকমে নিজের মাথাটা নাড়িয়ে মালতিকে ডাকলেন শশাঙ্কশেখর। প্রতিবন্ধি মানুষদের সিক্স সেন্স কাজ করে ভিষণ ভাবে। মালতি শশাঙ্কশেখরকে জড়িয়ে ধরে বিছানার উপর বসালো। কথা বলতে চাইছেন শশাঙ্ক কিন্তু কিছুতেই পারছেন না। তবে কি আয়ুর্বেদ ডাক্তার...............? না আর কিছু ভাবতে পারছেন না তিনি। শিউলি গাছটাতে বোধহয় ফুল ফুটেছে আজ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় এখনও কাজ করছে শশাঙ্কশেখরের। ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি মালতিকে বোঝাতে চাইলেন ওঁকে ওই শিউলি গাছটার কাছে নিয়ে যেতে। মালতি বুঝলোও সেটা। বহু কষ্টে মালতি ঘাড়ে সমস্ত শরীরটা ঢেলে দিয়ে ডান পা টেনে টেনে ফেলে শিউলি গাছের কাছে পৌছলেন দুজনে। হ্যাঁ বর্ষার শেষে ফুল এসেছে গাছে। গাছের গয়ে ঠেস দিয়ে শশাঙ্কশেখরকে বসিয়ে দিল মালতি। কথাগুলো শ্বাসনালীতে এসে আটকে আছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে তবু কিছুতে কথা বলতে পারছেন না বৃদ্ধ। কত কথা.........অনেক কথা.........।

শশাঙ্কবাবুকে ওই ভাবে বসিয়ে দিয়ে দৌড়ে মালতি ঘরের ভিতর ঢুকল। শিউলির গন্ধে আজ সত্যি সত্যি পরমব্রতার উপস্থিতি অনুভব করছেন শশাঙ্ক। অনেকক্ষণ বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাত-মুখ-চোখ দিয়ে বারবার ইশারা করে মালতি যা বোঝাতে চাইল এই প্রথম বোধহয় পুরোটাই বুঝতে পারলেন শশাঙ্কশেখর, ' উপরের ঘরদোর আলমারি সব খোলা, কোথাও নেই সোমলতা।' এত কষ্টের মধ্যেও মালতির সাহায্যে শিউলিতলায় আসার সময় লক্ষ্য করে ছিলেন শশাঙ্ক, ভোরবেলাতেই কেউ বাড়ির সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে।

****

পূরবী অ্যাপার্টমেন্ট, এম বি ৬৭৬/১২, সল্টলেক, কলকাতা-১০২ ,ফোন ৯৮৩৬৯০৫২৩১